ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1947-1953
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.419

রামমোহন: নারী ক্ষমতায়নের পথিকৃত

ড. ব্রততী চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 30.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The process of restoring the social status of a group of people who are deprived, humiliated, and neglected in society in various ways, by increasing their skills, potential, and strength is what is called empowerment in sociology. In our country, women have been neglected and deprived in various ways since ancient times. Re-establishing their rights and social respect is known as 'women empowerment'. To establish equality in men and women, the government has taken many steps at present. But if we look back at the history of our country, we will see that the process of women empowerment started in subjugated India. Raja Rammohan Roy, one of the social reformers of India, ignored the adverse social and religious conditions of that time and stood by the side of women. He fought to protect their rights. Just as he restored women's right to life by abolishing sati, he also promoted the importance of women in the public mind by speaking out against child marriage, caste system, etc. He tried to make the people of India realize that women are not objects, but living beings. He also thought about the economic empowerment of women. That is why he brought the issue of women's rights in their father's and husband's property before the British government. He tried to implement all the things that are beyond the imagination of today's modern people in those adverse times. In fact, he is a modern hero of all times.

Keywords: Women Empowerment, Rammohan Roy, Sati Culture, Child Marriage, Social Awareness.

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"[১]

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে তার প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে তিনি যুগে যুগে অধর্ম ও অধর্মীদের বিনাশের জন্য এবং সজ্জনদের ত্রাতা হয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বারে বারে ফিরে আসবেন। ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা তা ব্যক্তির বিশ্বাসভেদে বিতর্কের বিষয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, যে যুগে যুগে কিছু মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং

বিপন্ন মানুষের রক্ষকরূপে বিরাজ করেছেন। তাঁরাই আর্তদের ত্রাতা হয়ে দুষ্টদের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এমনই একজন যুগপুরুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়, যাঁর অসীম প্রজ্ঞা হিন্দুধর্মের প্রকৃতস্বরূপ বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করেছে এবং তৎকৃত বিভিন্ন সমাজসংস্কার নির্যাতিত জনগণকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসনের ভারে যখন ভারতবাসী নিষ্পেষিত, দেশ যখন অন্ধ কুসংস্কারে আছন্ন, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার কারণে জাতির জীবনধারা যখন রুদ্ধ, রক্ষণশীলতার উগ্র বেড়াজালে সমাজ যখন পদে পদে শৃঙ্খলিত, সেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দেশবাসীর কাণ্ডারী হয়ে আবির্ভূত হন রাজা রামমোহন রায়। সময়টা ছিল ১৭৭২ সাল (মতান্তরে ১৭৭৪)[২]। সেই বছরের ২২ শে মে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রামে রমাকান্ত রায় ও তারিনীদেবীর বা ফুলঠাকুরাণীর সন্তানরূপে ভারতের এই প্রথম আধুনিক পুরুষের জন্ম হয়। তাঁদের কৌলিক উপাধি ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। প্রপিতামহ শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের থেকে কাজের দক্ষতার কারণে 'রায়-রায়ান' উপাধি লাভ করেন। প্রচণ্ড মেধাবী রামমোহন খুব অল্পবয়সেই বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন ও সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন তাঁর চিন্তাজগতে নবজাগরণ ঘটায়। তাঁর নবজাগরিত মনন ও বিচারক্ষমতা অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই ভারতবর্ষকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। কোম্পানীর শাসনাধীন সেই পরাধীন ভারত সর্বকালের মুক্তমনা এই যুগনায়কের হাত ধরে 'আধুনিক' হতে শিখেছিল। দেশবাসীর দুর্দশা তাঁকে এতটাই ব্যাকুল করেছিল যে তিনি মানুষের মঙ্গলার্থে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। নিজের পরিবার, সমাজ কোনকিছুই তাঁর কর্মযজ্ঞকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। কখনও কোনও অবলা নারীকে চিরাচরিত বর্বর প্রথা থেকে মুক্ত করে, কখনও ধর্মান্ধদের সামনে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে, শিক্ষার পথকে উন্মুক্ত করে তিনি প্রকৃত অর্থেই 'ত্রাতা'র রূপে ভারতবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নানান একপেশে প্রথা, গতানুগতিক আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুনের গ্রন্থিতে আবদ্ধ অসহায় মানুষকে তিনি আশার আলো দেখিয়েছিলেন, অক্ষমকে দিয়েছিলেন ক্ষমতালাভের পথের সন্ধান। সমাজের সমস্ত পিছিয়ে পরা, দুর্বল মানুষের মধ্যে এই ক্ষমতায়ন ঘটেছিল। বর্তমান নিবন্ধে তৎকালীন সমাজে সর্বাধিক নির্যাতিত, অবহেলিত নারীজাতির ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তিকরণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

'ক্ষমতায়ন' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম চর্চিত বিষয়। ক্ষমতায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য নিজেদের শক্তি, দক্ষতা ও সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।[৩] সমাজে বৈষম্য ও বঞ্চনার স্বীকার হওয়া মানুষ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের জীবনকে নিজে নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা অর্জন করে, তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের যোগ্যতাও অর্জন করে। এই 'ক্ষমতায়ন' শব্দের সাথে যখন 'নারী' শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়, তখন বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামাজিকদের কাছে। কারণ, সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, পিতৃতন্ত্র, ধর্মীয় বিধান ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার নারীরাই বেশিমাত্রাতে হয়ে থাকে। নারী ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে—

> "Women empowerment may be defined as a process by which the powerless gain greater control over the circumstances of their lives."[৪]

ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এক সুস্থ স্বাভাবিক প্রগতিশীল সমাজের জন্য একান্ত কাম্য। বর্তমানে সরকার নারী ক্ষমতায়ন বা নারী সশক্তিকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছেন, যেমন— বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প, স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা, কন্যাশ্রী প্রকল্প, সুকন্যা প্রকল্প ইত্যাদি অসংখ্য প্রকল্প। এগুলির মাধ্যমে বর্তমান যুগে বহুনারী উপকৃত হচ্ছে ও সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এতো হল বর্তমান প্রেক্ষাপট।

বর্তমানযুগের প্রেক্ষিতে নারীর অধিকার ও তাদের ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তিকরণের ধারণা ও পদ্ধতি ভিন্ন। কিন্তু ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকারের ধারণা ও তাদের ক্ষমতায়নের পদ্ধতি সহজসাধ্য বিষয় ছিলনা। তবে ভারতের ইতিহাসে বর্ণিত নারী আন্দোলনের বহুপূর্বে নারীর অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করার লড়াই শুরু হয়েছিল সেই পরাধীন ভারতেই, রামমোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে। সেই অধিকার ছিল বেঁচে থাকার অধিকার, নিজের জীবনের সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার এবং জীবনধারণের অধিকার।

বর্তমান সময়ের নিরীখে 'নারী ক্ষমতায়ন' কথাটি বহুশ্রুত ও বহুচর্চিত একটি বিষয়। এখন যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই সুস্থ সমাজের রচনায় নারীর ভূমিকা ও তন্নিমিত্ত তার ক্ষমতায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম। কিন্তু আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে ভারতের যে সামাজিক পটভূমি, তার প্রেক্ষিতে নারী ক্ষমতায়নের চিন্তা ও তার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্যিই বিস্ময়কর। কোনও মানুষ কতটা আধুনিক হলে এহেন দূরদর্শিতা দেখাতে পারেন। রামমোহন বুঝেছিলেন যে সেই মুহূর্তে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের আগে তার জন্য অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। মাটির তৈরী কলসি যখন কাঁচা থাকে তখন যেমন তা জলধারণের উপযোগী হয়না, তেমনি কোন অধিকার ভোগের জন্য ব্যক্তির আধার শক্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে গৃহীত আধিকার ধারণ করে রাখতে পারে। তা যদি না হয় তাহলে স্বাধীনতা পেলেও তার সুফল দেশবাসী পাবে না। এই বাস্তবসত্য অনুধাবন করে তিনি তাই প্রথমে সমাজকে কুসংস্কার, ধর্মীয় ভ্রান্তধারণা, অশিক্ষা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করার পথ বেছে নেন। রামমোহন যেন সেই কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত নির্যাতিত নারীদের সমতা দানের জন্য, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বোপরি প্রাণরক্ষার জন্য তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার যোগ্যতা প্রদান। কিন্তু সেই সময় নারী বেঁচে থাকবে, না মৃত্যুবরণ করবে, সেই সিদ্ধান্তও তার নিজের নেওয়ার অধিকার ছিল না। তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে এক বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, তার নাম 'সতীদাহ'। সদ্য পতিহারা একটি বালিকা বা মহিলাকে স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গলার্থে স্বামীর মৃতদেহের সাথে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। সদ্য পতিবিয়োগের দুঃখে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মৃত স্বামীর সাথে সহমৃতা হতেন। স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সে 'সতী' আখ্যা পেত। অনেকক্ষেত্রে পারিপার্শিক অবস্থা বিচারের ক্ষমতা বা বয়স কোনটিই হতনা সেই মেয়েটির। এইভাবে শাস্ত্রের আদেশের অজুহাত দেখিয়ে কতশত নারীর থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার। রামমোহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ তিনি করবেন।[৫] যদিও তার আগেও 'সতীদাহ' এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এই নিয়ম বন্ধের জন্য আবেদনও হয়েছে, কিন্তু কোনমতেই তার উচ্ছেদ সম্ভব হয়নি। শাস্ত্রাচারের মোড়ক এটিকে আগলে রেখেছিল। রামমোহন সেই শাস্ত্রের বিধানের দ্বারাই প্রমাণ করেছিলেন যে এটি অমানবিক ও শাস্ত্রসম্মত নয়। শাস্ত্রজ্ঞদের মতে, যদি কোন রমণী তার স্বামীর মৃত্যর পর স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গলার্থে স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারেন, যদি সেই রমণী অপ্রাপ্তবয়স্কা, অন্তঃস্বত্তা, ঋতুমতী না হন। ১৮০৫ সালে গভর্ণর জেনারেল নিজামত আদালতের পণ্ডিতদের কাছে সহমরণের শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা জানতে চাইলে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা শাস্ত্রোক্ত 'সহমরণ' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই মতই উঠে আসে।[৬] সুতরাং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে সহমরণ সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক। কোনও রকমের জোর করা, মাদকের আশ্রয় নেওয়া সেখানে অভিপ্রেত নয়। কিন্তু বাস্তবচিত্র ছিল এর বিপরীত। সম্পত্তির ভাগ যাতে না দিতে হয় এবং ভরণপোষনের ব্যায় যাতে বইতে না হয়, সেই কারণে মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে জোর করে, অধিকাংশ সময়ে মাদকের প্রয়োগ করে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। যদি সে কোনক্রমে জলন্ত চিতা থেকে পালিয়ে যেত, তাকে পুনরায় ধরে এনে আগুনে বসিয়ে দেওয়া

হত। অথবা প্রথমেই তার হাত-পা বেঁধে মৃতব্যক্তির সাথে শুয়িয়ে দেওয়া হত। অনেকক্ষেত্রে যদি সেই নারীটি কোনোক্রমে মরণের হাত থেকে নিস্তার পেয়েও যেত কোন সজ্জনের সহায়তায়, সমাজে তার কোন স্থান হতোনা। উপরন্তু তার প্রাণসংহারের পুনঃপুন প্রচেষ্টা করা হত। যাতে পরবর্তীতে কেউ সমাজের এই নিয়ম লঙ্ঘন করার সাহস না পায়, তাই ধর্মগুরুদের এই প্রচেষ্টা। এহেন বর্বর প্রথার অবলুপ্তির জন্য রামমোহন সচেষ্ট হন। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে এই প্রথা রদ করার আবেদন জানান এবং নিজের মতের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র আইনপ্রণয়ন করলেই এই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথার অবলুপ্তি সম্ভব নয়। এর জন্য মানুষকে আগে সচেতন করতে হবে। যে শাস্ত্রের দোহায় দিয়ে ক্ষমতালোভী একশ্রেণীর মানুষ সকলকে বিপথে পরিচালিত করছে, সেই শাস্ত্রের প্রকৃত বার্তা তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ১৮১৮ সালে তিনি 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ' নামে পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে সহমরণ যে একটি ধর্মবিরুদ্ধ প্রক্রিয়া সেটি জনমানসে যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, যদি সহমরণ শাস্ত্রমতে অবশ্যকর্তব্য হত, তাহলে তা না করলে কি প্রত্যবায় হত তার বিধান শাস্ত্রে থাকত।[৭] সেটি না থাকায় সহমরণের অবশ্যকর্তব্যতা শাস্ত্রনির্দিষ্ট নয়। এছাড়া যেকোন কাম্যকর্ম শাস্ত্রে নিন্দিত। সহমরণও কাম্যকর্ম হওয়ায় তাও নিন্দনীয় হওয়া উচিত। আর সর্বোপরি শাস্ত্রে উল্লিখিত সহমরণ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে আচরণীয়। এই যুক্তি দিয়ে তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে শাস্ত্রাচার বা ধর্মাচারের নামে যে অমানবিক প্রথা চলে আসছে তার গতিরোধ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি জনমত গড়ে তোলেন এবং ৩০০ জনের স্বাক্ষর সহ সতীদাহ রদের আবেদনপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে জমা করেন। তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টা এবং ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা ও আনুকূল্যে অবশেষে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 'সপ্তদশ বিধি' নামে আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা রদ করেন। ভারতবর্ষ 'সতীদাহ' রূপ কলঙ্ক থেকে মুক্তির পথের সন্ধান লাভ করে।

রামমোহন রায় কেবলমাত্র নারীজাতিকে বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাই নয়, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, আর্থিক ও বৌদ্ধিক সংস্কারের দিকগুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে নারীজাতির শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলেন। সমাজে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী- এই মত তিনি পোষণ করতেন। তিনি তাঁর 'Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Female' গ্রন্থে এই সম-মর্যাদার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[৮] সমাজে প্রচলিত যে সমস্ত প্রথা নারীদের অবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির অন্তরায় সেই সকল নিয়মের বিরুদ্ধেই তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। যেমন— বাল্যবিবাহ। ভারতীয় হিন্দু সমাজে তখন ১০ বা ১১ বছর বয়সের বা তার থেকেও কমবয়সের কন্যাসন্তানকে পাত্রস্থ করার রীতি ছিল। না হলে পিতা সমাজে নিগৃহিত হতেন। এর ফলে সেই কন্যার না হতো লেখাপড়া, না তৈরী হতো ভালোমন্দ জ্ঞান। ফলে তার জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নিত তার পরিবারের সর্ববেত্তা পুরুষেরা। ফলস্বরূপ সে হতো নির্যাতিতা। রামমোহন এই দৃশ্যতে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এর পাশাপাশি সমাজের আর এক প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন, সেটি হল 'কৌলিন্য প্রথা'। সমাজের উচ্চবর্ণের পুরুষেরা নিজেদের 'কুলীন' বলে পরিচয় দিতেন এবং বহু বিবাহ করতেন। বংশ মর্যাদা রক্ষার খাতিরে কন্যার পিতা কুলীনের সাথে কন্যার বিবাহ দিতেন, সে তার বয়স পিতার বয়সের বেশিই হোক না কেন। বহুপত্নীর স্বামী তাদের কোন দায়িত্বই বহন করত না। রামমোহন এই প্রথা বন্ধের জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়। ১৮৭২ সালে 'ভারতীয় বিবাহ বিষয় আইন' বা 'National Marriage Act 1872' পাশ হয়। নিজেদের আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার দিকে নারীরা একধাপ এগিয়ে যায়।

রামমোহন 'বিধবা বিবাহ' এর সমর্থনেও আন্দোলন গড়ে তোলেন। স্বামীবিয়োগের পর বিধবার মর্মান্তিক পরিণতি বা দুঃসহ কৃচ্ছসাধনমূলক জীবনযাপন থেকে মুক্তির জন্য তাদের পুনরায় বিবাহের রীতি প্রচলনে উদ্যগী হয়েছিলেন তিনি। অধিকাংশক্ষেত্রে অতি অল্পবয়সেই নারীরা স্বামীহারা হতেন এবং তাদের জীবনে নেমে আসত বৈধব্য যন্ত্রণা ও সমাজের কঠোর বিধিনিষেধের পরোয়ানা। তাই তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়ে সোচ্চার হন। প্রথমেই জনসাধারণের মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যাবে না- এই বিষয়টি অনুধাবন করে তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ঘটিয়েছিলন। পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে 'বিধবা বিবাহের আইন' পাশ হয়। যে কোনও সংস্কারমূলক আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট তারিখের সীমায় বা কোন একজন ব্যক্তির একার উদ্যোগে ফলপ্রসু হয় না। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনও প্রথার অবলুপ্তির জন্য প্রথম পদক্ষেপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা পরবর্তীতে দৃষ্টান্তরূপে মনোবলবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। বিধবা বিবাহের অবলুপ্তির ক্ষেত্রে সেই পদক্ষেপ ছিল রামমোহনের।

নারী-পুরুষের অসাম্যের আর একটি নিদর্শন কন্যা সন্তানের হত্যা। সুদূর অতীতকাল থেকেই মানবসমাজের কাছে পুত্রসন্তান বহু আকাঙ্ক্ষিত। যদিও ঋগ্বেদীয় যুগে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কন্যাসন্তান উপেক্ষিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে সামাজিক অবস্থার অবক্ষয়ের সাথে সাথে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা বারতে থাকে। 'পুতাৎ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ' অর্থাৎ পুতনামক নরক থেকে পিতামাতাকে ত্রাণ করে বলেই তার নাম পুত্র। তাই পিতামাতার কাছে পুত্রসন্তান কাঙ্ক্ষিত ও কন্যাসন্তান উপেক্ষিত। কন্যাসন্তান থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য প্রাচীন ভারতে হিন্দু সমাজে কন্যা সন্তানকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জনের কুপ্রথা চালু ছিল। কন্যা সন্তানের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যয়ভার থেকে অব্যহতি পাওয়ায় ছিল এই প্রথার মূল কারণ। এছাড়াও কন্যা বিধবা হলে তার দায়ভারও পিতামাতার চিন্তার কারণ ছিল। এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন জনমত গড়ে তুলেছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ও ব্রিটিশ সরকারের কঠোরতায় ভারতের বহু কন্যা এই নির্মম প্রথা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

সমাজে মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রচলিত কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে রামমোহন যে শুধু সোচ্চার হয়েছিলেন তা নয়, মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য তাদের অর্থনৈতিক অধিকারের দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। কারণ নারী যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন না হয় তাহলে সে পরনির্ভর থেকে যাবে এবং তার সমস্ত সিদ্ধান্ত তার পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই গ্রহণ করবেন। তাই নারীদের অর্থনৈতিক অধিকারদানের জন্য তিনি সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার স্থাপনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হিন্দু সমাজে স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনও অধিকার ছিল না। ফলস্বরূপ তার নিজের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য স্বামীর আত্মীয়দের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো। রামমোহন এই নিয়মের বিরুদ্ধেও কলম ধরেছিলেন। ১৮২২ সালে তিনি 'Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Female'[৯] গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতে সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার থাকত। স্বামী মারা যাবার পর তার সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর ভাগ থাকত। সন্তান থাক বা না থাক সে স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হতো। এমনকি প্রতিটি মেয়েরই তার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার থাকত। রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের কাছে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়নের আবেদন করেছিলেন, যার দ্বারা মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকটি স্পষ্ট হয়। এই অবিরাম প্রচেষ্টার ফল হিসাবে ১৮৭২ সালে 'Special Marriage Act' পাশ হয়, যেখানে বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয় এবং সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকারটি নিশ্চিত হয়। এছাড়াও ১৮৭৪ এর 'The Married women's Property Act' এ স্ত্রীর সম্পত্তিক্রয়ের অধিকার ও স্ত্রীধনের উপর অধিকার সুনিশ্চিত হয়। নারী ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তিকরণের ক্ষেত্রে

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রামমোহন সেই কালেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অবিরাম নিরলস প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়েছে পরবর্তীতে প্রবর্তিত আইনসমূহের মাধ্যমে।

নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম উপায় হল শিক্ষার প্রসার। নিজের অধিকার, সমাজে সম্মানজনক অবস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই সমস্তকিছুই অধরা থেকে যায় শিক্ষার অভাবে। নারীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের নাম পৃথকভাবে কোনও আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও তৎকালীন সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে তাঁর যে অবদান তা নারী-পুরুষ উভয়ের বৌদ্ধিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তা ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য বা সরকারী কর্মচারী জোগান দেওয়ার জন্য নয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ভারতীয়দের যুক্তিবাদী মানসিকতার বিকাশ হবে। তিনি বুঝেছিলেন বিজ্ঞানই মানুষকে উদারচেতা ক্রতে পারে, মানুষের মনে যুক্তি করার ক্ষমতা তৈরী করতে পারে। আর সেই যুক্তিবাদী মন নিয়েই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার কাটিয়ে উঠা সম্ভব। তাই তিনি লর্ড আমহার্স্টকে একলক্ষ টাকা পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্য ব্যয়ের অনুরোধ করেন। ১৮১৬ সালে তিনি শুড়িপাড়ায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২২ সালে তার নাম দেওয়া হয় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল। পরে এর নাম হয় ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি। তিনি তাঁর সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় নারীদের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। নারীশিক্ষার প্রসার ও তার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কেবলমাত্র নারীদের উদ্যোগী করাই যথেষ্ট নয়- এই সত্যটি তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি সমাজের সকলকে নারীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী করতে চেয়েছিলেন। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর ভালো-মন্দ সমস্তই পরিবারের পুরুষের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তিতে ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন এবং সেখানে মদিলাদের অংশগ্রহণের ফলে মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টিতে স্বয়ং মহিলারা উদ্যোগী হলে নারীশিক্ষার বিষয়টি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রামমোহন রায় সেই সুদূর অতীতে নারী ক্ষমতায়নের যে বীজ বপন করেছিলেন, সেই বীজ ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে, বহু হিতৈষী সমাজসংস্কারকদের অবদানে পল্লবিত হয়ে আজ মহীরুহে পরিণত। বর্তমানে আমরা নারীমুক্তির কথা বলছি, নারীর বিভিন্ন অধিকার সংরক্ষণের কথা বলছি, চাইছি নারী-পুরুষের সাম্য, পড়ছি মানবী বিদ্যা, কিন্তু এই সকলই অধরা থেকে যেত যদি রামমোহন রায়ের মত মহাত্মারা পথের সন্ধান না দিতেন। তাঁর মতো মহামানব যদি না থাকতেন তাহলে আজকের নারী বর্তমান সামাজিক সুযোগসুবিধা থেকে তো বঞ্চিত হতো, তার সাথে তার কী অধিকার, সেসম্বন্ধেও ধারণাহীন রয়েই যেত। রামমোহনের সমস্ত সিদ্ধান্ত, তাঁর সমস্ত পদক্ষেপ, তাঁর দূরদর্শিতা, আধুনিকতার পরিচায়ক। 'অধুনা ভব' অর্থাৎ যা এই ক্ষণে বিদ্যমান তাই আধুনিক। সুতরাং আধুনিক শব্দটি কালের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল। ২০০০ সালে যা আধুনিক ছিল তা আজকে আর আধুনিক নয়। আবার আজকে যা আধুনিক বলছি, তা ২০৫০ সালে আধুনিক থাকবে না। কিন্তু রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে 'আধুনিক' শব্দটি সর্বদা প্রযোজ্য। কারণ তাঁর চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, বিচারক্ষমতা ছিল আধুনিক, যুগোপযোগী। তিনি শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাবন্ধ করার জন্য শাস্ত্রকেই ব্যাবহার করেছিলেন। পুরাতন সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত মত, কেবলমাত্র পুরাতন বলেই ত্যাজ্য- এই মতের সমর্থক তিনি ছিলেন না। বরং বিচারের দ্বারা বর্জনীয় বিষয় ত্যাগ করে যুক্তিসম্মত সঠিক সিদ্ধান্তকে তিনি গ্রহণ করেছেন, যা একজন প্রকৃত আধুনিক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তিনি প্রাচ্যের সারতত্ত্বকে গ্রহণ করে, পাশ্চাত্যের প্রগতিশীলতার সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন, ঘটেছিল ভারতের তথা বাংলার নবজাগরণ। সেই ভারতপথিকের দেখানো পথ ধরেই অন্যান্য মহাত্মারা এই দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে বার বার। সেই চিন্তনের, যুক্তিশীলতার পথ যদি এখনও অনুসৃত হয়, তাহলে উচ্চস্বরে দাবী করায় যায়—

বল বল বল সবে, শত বীণা বেনু রবে।
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

তথ্যসূত্র:

১। শ্রীবদ্ভগবদ্গীতা। ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ৭-৮। শ্রীগীতা, শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা. ১৩৭-১৩৮।

২। রামমোহন রায়ের জন্মসাল প্রসঙ্গে শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন রায়' শীর্ষক গ্রন্থে ১৭৭৪ সালের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জন ডিগবীর উক্তি অনুযায়ি ১৮১৭ সালে রামমোহনের বয়স ছিল ৪৩ বছর। ডিগবীর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮০০ সালে, যখন তাঁর বয়স ২৭। ১৭৭৪ সালে রামমোহনের জন্ম হলেই এই বয়স সম্ভব।– দ্রষ্টব্য 'রামমোহন রায়', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা ১২।

৩। Asia and Pacific Centre for Women and Development ক্ষমতায়নের ব্যাখ্যায় বলেছে— "Empowerment is a process by which the conditions for self-determination of a particular people or group can be created".

৪। দ্রষ্টব্য Batliwala, S. (1994). The Meaning of Women's Empowerment: New Concepts from Action. In *Population Policies Reconsidered: Health, Empowerment, and Rights* (pp. 127–138).

৫। বলা হয় তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের পত্নীকে এই বর্বর প্রথা থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। তখনই তিনি এই প্রথা রদ করানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

৬। দ্রষ্টব্য মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৬।

৭। রায়, রাজা রামমোহন। *সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ*। ১৮১৮।

৮। Roy, R. R. (1822). *Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females*. Calcutta.

৯। Roy, R. R. (1822). *Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females*. Calcutta.

গ্রন্থপঞ্জি:

১। ঘোষ, অজিত কুমার (সম্পা)। রামমোহন রচনাবলী। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩।

২। গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র। রামমোহন প্রসঙ্গ। কলকাতা, ১৩৫২।

৩। ঘোষ, মুরারি। অনন্য রামমোহন অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও যুগনায়ক। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯।

৪। ঘোষ, শ্রীজগদীশ চন্দ্র। শ্রীগীতা। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৫।

৫। চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত। ইন্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ, ১৯২৮।

৬। চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। কলকাতা, ব্রহ্মাব্দ ৬০।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। রামমোহন রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৯।

৮। বিশ্বাস, দিলীপকুমার। রামমোহন সমীক্ষা। সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৭৩।

৯। মাইতি, প্রভাতাংশু। ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১৫২৬ খ্রীঃ-১৯১৪ খ্রীঃ)। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫।

১০। মুখোপাধ্যায়, জীবন। ভারতের ইতিহাস (১৫২৬-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২।

১১। রহমান, মাহবুবুর। বাংলার ইতিহাস (১৭৫৭ খ্রি থেকে ১৯৪৭ খ্রি পর্যন্ত)। বুকস্ ফেয়ার, ঢাকা, ২০১৮।